সোজন বাদিয়ার ঘাট ও প্রভাব-বঞ্চিত প্রতিভা জসীমউদ্‌দীন

শিবনারায়ণ রায়

।। এক।।

নক্সী কঁাথার মাঠ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে, সোজন বাদিয়ার ঘাট ১৯৩৩-এ। দু'টি কাব্যকাহিনিরই বিষয় সরলমতি দু'টি তণতণীর প্রেম, দু'টিরই সমাপ্তি ট্র্যাজেডিতে। কিন্তু সোজন বাদিয়া আকারে নক্সী কাঁথার দ্বিগুণ। ছাপা চেহারায় নক্সী কাঁথা কাব্যগ্রন্থটি ৮০ পৃষ্ঠা, অপরটি ১৬০ পৃষ্ঠা। তা ছাড়া প্রথম কাহিনির তুলনায় পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে ছন্দ এবং ঘটনাবিন্যাস নিয়েও বেশ কিছু বৈচিত্র আছে। তবে এই দুটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে মূল পার্থক্য ট্র্যাজেডির উৎস নির্দেশে। রূপাই আর সোনা-সাজুর বড় মধুর সংসার ভেঙে গেল চরের জমির ধান দখল নিয়ে বন গেঁয়োদের সঙ্গে কাইজা বাধার ফলে। এই কাহিনিতে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সামান্যতম ইঙ্গিত ছিল না। গ্রামের যে আবহাওয়ায় জসীমউদ্‌দীনের কৈশোর কেটেছিল তার মনকাড়া বিবরণ আছে তাঁর শেষ জীবনের অসমাপ্ত রচনা "জীবন কথা"-তে। জসীমউদ্‌দীনের বাবা জমিজমার তদারকির চাইতে অতি সামান্য মাইনেয় স্কুলে পড়াতেই ভালবাসতেন। সেখানে তাঁর প্রাণের বন্ধু ছিলেন হেডমাস্টার সুরেশচন্দ্র বসু। জসীমউদ্‌দীন এই দু'জনকে তাঁদের সেই ছোট স্কুলের "দুই পূজারী" বলে উল্লেখ করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের বাজান এই স্কুলে পাঁচ টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলেন তাঁর "শ্রদ্ধেয় শিক্ষক" রাজমোহন পণ্ডিত মশায়ের আহ্বানে। বিশ শতাব্দীর সেই সূচনা পর্বে অবিভক্ত বাংলার অন্তত গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহজ এক ধরনের আত্মীয়তা বজায় ছিল। জসীমউদ্‌দীন সেই বিগত দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন

গ্রাম দেশে পাকা মুসলমান খুব কমই দেখা যাইত। লক্ষ্মীপূজা, হাওই সিন্নি ও গাম্বীর উৎসবে সমস্ত গ্রাম মাতিয়া উঠিত। .... খুব সম্ভব লক্ষ্মী পূর্ণিমায় হাওয়া সিন্নির উৎসব হইত। ..... আমাদের পূর্বপুষরা এই সব উৎসবে কোরাণশরিফ পড়িয়া আসিতেন। তাঁহারা বলিতেন লোকে ত এসব উৎসব করিবেই। আমরা ইহার মধ্যে কোরাণ শরিফ পড়িয়া কিছুটা মুসলমানীত্ব বজায় রাখি। (পৃ ১৪) তাতে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনও হেরফের ঘটত না। সে যুগে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব শিক্ষকের মতোই জসীমের বাজানের নিত্য পরিধেয় ছিল ধুতিপাঞ্জাবি, কাঁধে একপাটা পাতলা চাদর এবং হাতে ছাতি। মুখভরা সুন্দর দাড়ি, মাথায় টুপি। পাঠশালায় জসীমের বন্ধু ছিল বিনোদ। তার বাড়িতে ছিল একটি কালো তুলসীর গাছ।

এই তুলসী গাছটির পানে চাহিয়া থাকিতাম। লাল কালোতে মিশানো পাতাগুলি কতই সুন্দর। কাছে যাইয়া গন্ধ শুকিতে প্রাণ ভরিয়া যাইত। .....বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার নিকট হইতে একটি কালো তুলসীর চারা বাড়িতে আনিয়া লাগাইলাম। মুসলমান বাড়িতে তুলসী গাছ লাগাইয়া অনেকের কাছে সমালোচনার পাত্র হইলাম, কিন্তু আমার তুলসীগাছটি যখন বড় হইল তখন ওষধি হিসাবে ইহার পাতা লইতে এ বাড়ি ও বাড়ি হইতে যখন লোক আসিত, আমার বুক গর্বে ভরিয়া যাইত। (পৃ ২৯)

এই ছিল গ্রামবাংলার সেই জগৎ যেখানে জসীমউদ্‌দীনের ধ্যানধারণা, কল্পনা-অনুভূতি পুষ্ট হয়েছিল, যেখানে পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-আচরণ বজায় রেখেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পারস্পরিক সহযোগ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জসীমউদ্‌দীনের লেখা পড়ে এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পরও আমি নিশ্চিত জানতাম ধর্মীয় গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষ কোনও সময়েই তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়নি।

কিন্তু বাইরের জগতে, বিশেষ করে অবিভক্ত বঙ্গদেশের আবহাওয়াতে তখনই দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছিল। প্রথমে তা আবদ্ধ ছিল শহরের রাজনীতি-অর্থনীতির জগতে, কিন্তু ক্রমে তা গ্রামাঞ্চলেও বিস্তার লাভ করল। গান্ধীর বিদ্ধে কংগ্রেসে পূর্ণ স্ব াধীনতার প্রস্তাব প্রথম আনেন হসরৎ মোহানি ১৯২১ সালে। মস্কো-বার্লিনবাসী কমিউনিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। মোতিলাল প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা যখন তাঁদের নেহ রিপোর্টে মুসলমানদের তরফ থেকে তোলা সব প্রস্তাব বাতিল করে তাঁদের রাজনৈতিক আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিলেন, দেশপ্রেমিক হসরৎ মোহানি গভীর ক্ষোভে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, যিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দু'টি দশক হিন্দু মুসলমান মৈত্রী এবং জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, তিনিও সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাবে এবং কংগ্রেসি মাতববরদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু কালের জন্য রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। পরে যখন তিনি রাজনীতিতে আবার ফিরে এলেন, তখন তাঁর মন থেকে হিন্দুমুসলমান মিলনের প্রতীতি অবলুপ্ত। তার আগেই অন্য যে মহম্মদ আলি—যিনি খিলাফৎ এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এক সময়ে ছিলেন গান্ধীর প্রায় ডান হাত,—১৯৩০ সালে এপ্রিল মাসে নিখিল ভ ারত মুসলিম সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করলেন "আমরা আর মিস্টার গান্ধীর সঙ্গে আন্দোলনে নামতে রাজি নয়, কারণ গান্ধীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, এর উদ্দেশ্য হিন্দু নেতাদের হাতে সাত কোটি মুসলমানকে সঁপে দেওয়া।" পরে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে বললেন, "আমি শুধু একটি জগতের অধিবাসী নই। আমি যেমন ভ ারতের অধিবাসী তেমনই সারা বিশ্বে বিস্তৃত মুসলিম জগতেরও অধিবাসী"। গোল টেবিলে নেতারা যতই নিষ্ফল দর কষ াকষি চালালেন ততই তাঁরা এ দেশের ভিতরকার বিভিন্ন ফাটল এবং স্বার্থে স্বার্থে বিরোধকে স্পষ্টতর করে তুলতে ল াগলেন। ক্রমে যা ছিল মুখ্যত শহরের উপরতলার দলাদলি তা গ্রামেও সঞ্চারিত হল।

ইতিমধ্যে মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা গড়ে উঠেছে। অন্য দিকে গড়ে উঠছে মুসলমানদের তানজিম আর তবলিগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়াতে শু করেছে। সরকারি হিসাব অনুসারে ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে ১১২টি হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। লক্ষণীয় যে ভারতের অন্য প্রায় সর্বত্র মুসলমানরা মুখ্যত নগরবাসী অথব া নগরের প্রত্যন্তনিবাসী। অপরপক্ষে বাংলাদেশে অধিকাংশ মুসলমানই গ্রামবাসী, বেশির ভাগই কৃষিকাজে নিযুক্ত। আব ার অবিভক্ত বঙ্গদেশে অধিকাংশ মুসলমান পূর্ববঙ্গেই বাস করেন। সেন আমলে হিন্দু সমাজকে যে তথাকথিত ছত্রিশ ভাগে পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল, তাদের ভিতরে নীচের তলার একটা বড় অংশ ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করেন। তার অবশ্য একটা কারণ হিন্দুদের মতো ইসলাম ধর্মে জাতিভেদের বালাই নেই; দ্বিতীয় এবং বিশেষ কারণ মুসলমানদের মধ্যে যারা পীর বা প্রচারক তাঁরা উদ্যোগী পুষ ছিলেন। তাঁরা জমিহীন নিম্নবর্গের মানুষদের নেতৃত্ব দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সেই সব অঞ্চ লে যে সব অঞ্চ ল আগে বাসের অযোগ্য বলে উচচবর্গের হিন্দুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল। বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রচার এবং পূর্বে পরিত্যক্ত জমিতে চাষ-আবাদ এবং উপনিবেশ স্থাপন, এ দুয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক অ াছে। এবং এ ব্যাপারে পীর-দরবেশদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় মানুষ নিজেদের শরিফ বা আশরাফ ভাবতেন—তাঁদের পূর্বপুষরা নাকি বিজয়ী রূপে ইরানতুরান থেকে বঙ্গ দেশে এসেছিলেন—আজলাফ বা নিম্নবর্গের বাঙালিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল নিতান্ত ক্ষীণ। তাঁরা নয়, এই উদ্যোগী পীর দরবেশরাই নেতা হয়ে রূপ দিলেন একদিকে যেমন ধর্মান্তরিত দরিদ্র মুসলমানদের উপনিবেশগুলিকে, অন্য দিকে এঁদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নিম্নবর্গের হিন্দুদের ধ্যান-ধারণা মিলেমিশে একটি বিশিষ্ট বঙ্গীয় ইসলামের রূপ গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ে কিছু মূল্যবান গবেষণা করেছেন ঐতিহাসিক অসীম রায়। এই মিশ্র, দেশজ বঙ্গীয় ইসলামের সঙ্গে জসীমউদ্‌দীনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং আত্মীয়তা ছিল।

কিন্তু বিশের দশকের শেষ ভাগ থেকে বাংলার সামাজিক ও মানসিক জগতে দ্রুত রদবদল চলতে থাকে। চাষিদের (মুখ্যত মুসলমান) আর্থিক এবং শিক্ষাগত উন্নতির জন্য যে সব সরকারি চেষ্টা শু হয় প্রতি ক্ষেত্রেই তাতে বাধা আসে হিন্দু নেত াদের কাছ থেকে। জমিতে রায়তের অধিকার কিছুটা প্রতিষ্ঠা হলে জমিদারদের শোষণে বাধা পড়ে; ঋণের ওপরে সুদ কম ালে মহাজনের ক্ষতি হয়; এবং জমিদার ও মহাজন বেশির ভাগই হিন্দু। চাষিরা লেখাপড়া শিখলে হিন্দু জমিদার, আমলা বা মাতববরদের কি মানবে? শু হয়েছিল শহরে ভোটাভুটি, ক্রমে গ্রামে ছড়ায়। এবারে হিন্দুদের হঠবার পালা; মুসলম ানদের সরব হবার সুযোগ। গ্রামে একদিকে সক্রিয় হয়ে উঠল জমিদারের নায়েব সেপাই, অন্য দিকে মোল্লা মৌলবি। স

াময়িকভাবে বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে নিম্নবর্গের কিছু হিন্দুর আঁতাত ঘটেছিল। ১৯২৬ সালের ১৪ই জুলাই 'বরিশাল হিতৈষী' লেখে যে চারপাশে যে সব বড় বড় জনসভা হচ্ছে সেখানে দেখা যায় মুসলমান আর নমশূদ্ররা একত্র হয়ে উচচবর্গের হিন্দুদের বিদ্ধে আন্দোলন শু করেছে। মুসলমানদের মতলব এক দিকে এই ঐক্য রচনা করে হিন্দু উচচশ্রেণীর পতন ঘটানো, অন্য দিকে নমশূদ্রদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে মুসলমানদের সংখ্যাগুত্ব বাড়ানো।

অর্থাৎ এবারে বেশ সচেতন ভাবেই চেষ্টা শু হয় যাতে গরিব মুসলমান আর বর্ণ হিন্দু সমাজের অন্ত্যেবাসীরা না ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। বাংলার গ্রামে তাদের মধ্যে দাঙ্গা পাকানোর উদ্যোগ শু হয়ে যায়। এই উদ্যোগে একটা বড় ভূমিকা ছিল হিন্দু জমিদার, তাদের দেওয়ান-নায়েব-পাইক আর লেঠেলদের।

।। দুই ।।

সোজন বাদিয়ার ঘাট পড়বার আগে এই পটভূমির সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়ত সহায়ক। জসীমউদ্‌দীন নজল নন যে এই ষড়যন্ত্রের বিদ্ধে তাঁর প্রবল প্রতিবাদ উচচকিত রূপ পাবে। তাঁর মনের গঠনে আগুন আর হাওয়ার চাইতে মাটি আর জলই ছিল পরিমাণে বেশি। আমাদের দুর্ভাগ্য, যা তিনি গভীর বেদনায় অনুভব করেন, তার বিবরণ রেখে যান, এবং আম াদের মধ্যে যারা অনুভূতিশীল তারা মিছিলে সরব না হলেও সেই বেদনায় অশ্রুপাত করে অপর পক্ষে ত্রিশের দশকের যঁ ারা বিশিষ্ট এবং শক্তিসম্পন্ন কবি, যাঁদের মধ্যে অনেকেই সেকালে নিজেদের প্রগতিশীল বলে ঘোষণা করে বেড়াতেন, ব াংলার গ্রামের ট্র্যাজেডি তাঁদের রাতের নিদ্রা হরণ করেনি। তাঁরা তখন ব্যস্ত ছিলেন ইয়োরোপে হিটলার-মুসোলিনিদের নাটকীয় ত্রিয়াকাণ্ডের বিদ্ধে এ দেশে জনমত তৈরি করতে।

সোজন বাদিয়ার ঘাট-এর নায়িকা গদাই-নমুর কালো মেয়ে দুলী। তার সেই কালোয় এসে মিশেছে ধানের ছড়ার আর টিয়া পাখির রং—

দূর্বাদলে রাখলে তারে দূর্বাতে যায় মিশে
মেঘের ঘাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।

না সে রহস্যময়ী বনলতা সেন নয়, আকাশে বাতাসে প্রতিধবনি তোলা কঙ্কাবতী নয়, বালিগঞ্জি আর্টেমিস অথবা স্বর্ণকেশী নর্মসখীও নয়। শ্যামল তার তনু, হাতে কাঁচের চুড়ি, দুই পায়েতে কাঁসার খাড়ু, ছিপছিপে তার পাতলা গড়ন, তার দুটি প ায় জড়ানো নানা সুরের ছড়ার নূপুর।

যে শিমুলতলী গাঁয়ে তার বাস সেখানে নমশূদ্র আর মুসলমান গলায় গলা ধরে বাস করে—'হিন্দুর পূজায় মুসলমানে বয়েত গাহেন গায়' আর মুসলমানের 'দরগাতলা'য় হিঁদুর মেয়ে প্রণাম করে 'ভালের সিঁদুর দিয়ে'। নমু পাড়ার প্রধান গদ াই মোড়ল—মস্ত তার ধানের গোলা, সাতটি জোয়ান পোলা, আর তাদের সবার গরব গদাইয়ের মেয়ে দুলালী বা দুলী। সেই দুলীর আশৈশব প্রাণের বন্ধু মুসলমান ছেলে সোজন, 'ছমির শেখের ভাজন বেটা, বাবরী মাথায় ঘেরা'। তারা যেন দুটি গাঙ-শালিক, সারাটা গায়ে টহল দিয়ে দিয়ে বেড়ায়।

সেই শিমুলতলী গাঁয়ে সব উৎসবেই হিন্দু মুসলমান সমান আনন্দে অংশ নেয়, ছোঁয়াছুঁই যে একেবারে নেই এমন নয়, কিন্তু কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করে না, সরস্বতী পুজোর নাড়ু খেতে যেমন মুসলমানের বাধে না নমুর পোলার পীড়ায় তেমনই পীরের পড়া জলই হয় শেষ আশ্রয়। এই চমৎকার প্রীতির আবহাওয়াতে সোজন আর দুলীর ভালবাসা বিনা উত্তেজনায় বিনা বাধায় বিনা শহুরে নানা ন্যাকামি ছাড়াই ত্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে। জসীমউদ্‌দীন গ্রাম্য কাহিনির রীতি অনুসরণ করে ধীরে ধীরে তাদের সেই সহজ সুন্দর বিকচমান ভালবাসার রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারা বালকবালিকা থেকে ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্তির দিকে যাচ্ছে।

সোজন যেনবা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছড়িয়া কূল করে টানাটানি
নামেও সোজন, কামেও তেমনি, শান্ত স্বভাব তার
কূল ভেঙ্গে নদী যতই বহুক, সে তারি গলার হার।

দুলীর ইচ্ছে করে সোজনকে সে লুকিয়ে রাখে তার সিঁদূর কৌটো ভরে। আর সোজনের ইচ্ছে যখন সে খুব বড় হবে, কে ান পাটের নায়ের ভাগী হয়ে দূর দেশে গিয়ে বহু টাকাকড়ি জমিয়ে ফিরে আসবে, তখন দুলীর জন্য নিয়ে আসবে মধুমালা

শাড়ি। কিন্তু দুলী শাড়ির সঙ্গে চায় সিঁদূর কৌটো, শাঁখের চুড়ি আর ময়ূরের পাখা।
কিন্তু সেই নিষ্পাপ সরল দুটি ছেলেমেয়ে তো জানত না যে
গোরস্থানের কবর খুঁড়িয়া মৃতেরা বাহির হয়ে,
সাবধান পদে ঘুরিছে ফিরিছে ঘুমন্ত লোকালয়ে
....
রহিয়া রহিয়া মড়ার খুলিতে বাতাস দিতেছে শীস
সুরে সুরে তার শিহরি উঠিছে আঁধিয়ারা দশ দিশ।

এই প্রেতদের বাস তো শুধু কবরের মধ্যে নয়, আমাদের মগজের মধ্যেও। একদিন দুলীর মায়ের নজরে পড়ল দুলী এখন "ধাড়ী মেয়ে", তার বয়েস হয়েছে, পাড়ার ধাঙড় ছেলেদের সঙ্গে খেললে লোকেরা কী বলবে! দুলী বয়সের নিষেধ না ম ানায় সোজনের সামনেই তার পিঠে তিন চারটি কিল পড়ল। অসহায় সোজন এই দৃশ্য দেখে এলোমেলো পায় বনেবাদ াড়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষে এসে বসল নিম গাছটির ধারে। তখন পেছন থেকে তার দু'চোখ চেপে ধরল ঘর থেকে পালিয়ে অ াসা দুলী। তারা ভাবতে বসল বয়স কাকে বলে; কবে তাদের বয়স হল। আর যখন তারা সবে তার কিছুটা আভাস পেয়েছে, দুলী ঠোঁট খুলে দাঁড়িয়েছে সোজনের মুখভরা গান নিজের মুখে ভরে নেবে এই আকাঙক্ষায়, রসভঙ্গের মতো দুলীর মা এসে হাজির, কিল থাপ্পড় মারতে মারতে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল আপন বাড়ি। আর শাসিয়ে গেল সে াজনের বাপকে ডেকে সব বলে তার বেহায়ামির শাস্তির ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু আমাদের সমাজে গুজনদের তরফ থেকে এ ধরনের বাধা তো হামেশাই ঘটে। সোমত্ত মেয়েকে আর একটি ছেলেকে সম্ভবত চুম্বনের পূর্বমুহূর্তে আবিষ্কার করলে মায়েদের এমনতর প্রতিত্রিয়াই প্রত্যাশিত। তবে এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিশেষ ওলটপালট ঘটে না। বরং ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায় যখনমহরমের দিন শিমুলতলীতে বিরাট মহোৎসবে ছমুর পোলা সোজন মস্ত ভূমিকা নেয়। আজ আর ধনীগরিবে কোনও ফারাক নেই। সে াজন ভাল গায়েন, লাল গামছা ঘুরিয়ে মাথায় নেচে নেচে সে মহরমের কণ কাহিনি গায়। গাইতে গাইতে এল যুদ্ধের বিবরণ, কমবখ্ত্ এজিদের বিদ্ধে আত্রোশে ফুঁশে উঠল লোকেরা,

সেই আগুনে জ্বলছে আজি শিমুলতলীর গাঁয়ের সবে
এবার তারা মাতবে যেন বহ্নি-নাগের মহোৎসবে

আর সেই ভয়ঙ্কর নাচে শিমুলতলীর শুধু মুসলমানরা নয়, নমশূদ্ররাও এসে মহা উল্লাসে যোগ দিল। গদাই মোড়ল লাঠি ঘোরায়, নিতাই ধোপা খোলা কৃপাণ হাতে নাচে। উৎসবের শেষে লাঠি খেলা। লাঠির খেলায় সাতগেরামে প্রধান মদন মিঞা। তাক এসে সোজন বিনয় করে বলে, চাচা তোমার সঙ্গে পারব না জানি, তবু বড় ইচ্ছে এক হাত খেলি। প্রচণ্ড খেলা শু হল, চার বারের বার সোজনের লাঠির পালটা দিতে গিয়ে মদন মিঞার লাঠি চলে গেল সোজনের হাতে।

কাব্যকাহিনির এই অংশ (এবং এটি যদি মঞ্চে অভিনীত হয় এই দৃশ্য) পাঠক তথা দর্শককে অবশ্যই মুগ্ধ করবে। ম াইকেলকে জসীমউদ্‌দীন পাহাড়ের চূড়া থেকে নামিয়ে এনেছেন গ্রামের সমতল জমিতে—এখানে অমিত্রাক্ষর চলে না—কিন্তু জসীমের ভাষা এখানে খুবই দ্রুতগতি এবং মানানসই। এমনিতর জমজমাট নাটকীয় ঘটনা এই কাহিনিতে আরও অ াছে।

মদন মিঞা সোজনকে সাবাস দিয়ে বলে, তিরিশ বছর এই লাঠি ছিল আমার প্রাণ, ভেবেছিলাম যখন গোরে যাব এ লাঠি ধুলোয় পড়ে থাকবে। সে লাঠি ধরবার যোগ্য লোক যে আজ পেলাম এ আনন্দ রাখার জায়গা নেই। এ লাঠি এখন তোম ার।

আর ঠিক যখন এই কাহিনি রাজসিক বিজয়পর্ব থেকে সাত্ত্বিক ত্যাগ পর্বে উঠে এসেছে সেই মুহূর্তে তামস পর্ব এসে সব গ্র াস করে নিল। সামান্য কী কারণ নিয়ে হঠাৎ নমু-মুসলমানের মধ্যে কাজিয়া শু হয়ে গেল। বাইরে থেকে অনেকে এসেছিল কাজিয়া বাধাবার উদ্দেশ্যে, তাদের আত্রোশ শিমুলতলীর এ শান্ত অসাম্প্রদায়িক মেলামেশার ওপরে। সাউদ পাড়ার, ভ াজনপুরের শেখরা দলে দলে এসে জমা হয়েছিল। নমুরা মহরম উৎসবে ছিল নিতান্তই সংখ্যালঘু। তারা সবাই বেদম ম ার খেল। কাহিনির এক-চতুর্থাংশে পৌঁছে কাহিনির মোড় পালটে গেল, লিরিক রূপ নিল নাটকে, প্রেমের কাহিনিতে

প্রবেশ করল সমকালীন সাম্প্রদায়িক আখচা আখচির ইতিহাস।

।। তিন।।

রামনগরের নায়েব মশায়—চাষির ভিটেয় ঘুঘু চরানো যার পেশা, চাষির রক্ত শুষে যার দালানকোঠা—তার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গদাই আর নমশূদ্রর দল। নায়েব মশাই ঠিক করেছিলেন শিমুলতলী থেকে নমু আর নেড়ে দুই-এরই উচ্ছেদ করে সেখানে জমিদারের হাট বসাবেন, এতদিন নমশূদ্র আর মুসলমানদের সৌহার্দ্যের সামনে তাঁর প্যাঁচ খাটছিল না। যেই খবর পেলেন সে সৌহার্দ্য টুটে গেছে, অমনই তাঁর হিন্দুত্ব চাগিয়ে উঠল। রক্ষেকালীর মালা গলায় জড়িয়ে হুকুম দিলেন শিমুলতলীর গ্রাম থেকে মুসলমানদের একেবারে উচ্ছেদ করে দিতে। তিনি এবং তাঁর দলবল পেছনে থাকলে রক্ষাকালীর আশীর্বাদে ভয়টা কোথায়। উচ্ছেদের প্রস্তাবে ঘাবড়ে গিয়ে গদাই এবং আরও কিছু নমশূদ্র প্রবীণজন আপত্তি তুলল।

এক গেরামের গাছের তলায় ঘর বেঁধেছি সবাই মিলে
মাথার ওপর একই আকাশ হাসছে নানা রঙের নীলে
এক মাঠেতে লাঙল ঠেলি, বৃষ্টিতে নাই, রৌদ্রে পুড়ি
সুখের বেলায় দুখের বেলায় ওরাই মোদের জোড়ের জুড়ি।

যারা আমাদের মেরেছিল তারা ভিন্ন দশ গেরামের লোক। শিমুলতলীতে যে মুসলমানরা থাকে তারা সংখ্যায় অনেক কম। তারা ভাইয়ের মতো, তাদের কি করে উচ্ছেদ করব?

নায়েব মশায় তখন তাঁর চরম অস্ত্র ঝাড়লেন। মুসলমানদের যদি তোরা মেরে না তাড়াস, দু'চার দিনের মধ্যে ডিক্রিজারি করে তোদের সব কটাকে গ্রামছাড়া করব। নিপায় নমুরা নায়েবের নির্দেশ মেনে নেয়, বলে রক্তখাকির এই আদেশ।

শিমুলতলীর মুসলমানদের কাছে এ খবর পৌঁছতে দেরি হল না। মসজিদে যুবা-বুড়ো সকলের জমায়েত। প্রাচীন হাজি সাহেব শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি বললেন কাজিয়া/লড়াই না করে, চল আমরা মুসলমানেরা সকলে শিমুলতলী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই, বসত করি। প্রশান্ত মুখ, মমতা জড়ানো আশি বছরের বৃদ্ধ মনির মুন্সির কথা উষ্ণরক্ত তরুণরা শুনবে কেন? তাদের মুখপাত্র হয়ে সোজন বলল, প্রাণ দেব কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে কিছুতেই পালাব না।

গাছেরা ইহার দোলায়েছে ছায়া, বাতাস করেছে মায়ের মত
মাটি দেছে তার সোনার ফসল লাঙলের ঘায়ে হইয়া ক্ষত।
বাপ ভাইদের কবর খুঁড়িয়া শোয়ায়েছি এর মাটির তলে,
ভিজায়েছি এর শুষ্ক ধূলিরে কত বিষাদের নয়ন জলে।
....
এ গাঁও ছাড়িয়া যাব না- যাব না, রক্ষা করিতে ইহার মাটি,
প্রাণ যদি যায় সে প্রাণ হইবে বাঁচার চাইতে অনেক খাঁটি।

মুন্সি কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাতে পারলেন। মুন্সি সাহেবের পিছনে পিছনে দেশ ত্যাগ করে চলল শিমুলতলীর সর্বস্বান্ত মুসলমানরা। পিছনে পড়ে রইল পূর্বপুরুষের কবরস্থান যেখানে শবেবরাতের রাতে আর মোমেরবাতি জ্বলবে না। মুন্সি সাহেবের —

...পিছে পিছে শিমুলতলীর সকল মানুষ চলেছে কাঁদি,
পৃথিবীর যত অন্যায় আর বেদনার যেন হইয়া বাদী।

এদিকে নায়েবের কাছে কথা দিয়ে এসে নমশূদ্ররা মুসলমান প্রতিবেশীদের সমূলে উচ্ছেদের জন্য তৈরি হচ্ছে। অষ্টম সর্গে তারই বিবরণ। এ সর্গ-ও বেশ নাটকীয়, জমজমাট। মুসলমানদের গ্রামত্যাগের বার্তা তখনও এসে পৌঁছয়নি।

উল্লাস ভরে নাচে নমুদল মশালের পর মশাল জ্বালি
খড়গ ঘুরায়ে, সড়কী ঘুরায়ে ডাক ছেড়ে চলে হাজার ঢালী।
চলে আসে তারা বাঙড়ের পথে, চরণে মথিত মেদিনী মাটি
হাতে উলঙ্গ আগুন নাচিছে, কালো মশালের ধরিয়া ডাঁটি।

কিন্তু যেমন মুসলমানদের ক্ষেত্রে তখনও ঠাণ্ডা মাথা মিষ্টি স্বভাবের মুন্সি সাহেবের কণ নির্দেশের প্রাধিকার ছিল, তেমনই নমশূদ্রদের ওপরেও তাদের বিচক্ষণ গদাই মোড়ল ভ্রাতৃহত্যার বিদ্ধে শেষ মুহূর্তে তার ক্যারিজম্যাটিক প্রভাবকে সেদিন সপ্রতিষ্ঠ করতে পেরেছিল। মোদ্দা কথা মুসলমানরা গ্রাম থেকে বিতাড়িত হল বটে, কিন্তু যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটতে চলেছিল দু'পক্ষেই বুঝদার নেতা থাকায় শিমুলতলীতে সেদিন তা ঘটল না। রক্তপাত না করেই নমুরা তাদের গাঁয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে মুসলমানেরা শিমুলতলী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যখন আবার সকাল এল, জল থই থই দিঘির ধ ারে কুমারী মেয়েরা যখন নীরবে মাঘ-মণ্ডল ব্রতের শোলক পাঠ করছে, শিশুদের কাকলীতে নমুদের বাড়িগুলি ভরে গিয়েছে, তখন আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতো খবর এসে পৌঁছল সন্ত্রস্ত গোটা মুসলমান সমাজের স্বদেশ শিমুলতলী ত্য াগের। শূন্য পীরের দরগা, মসজিদে আজান নেই, মেহেদির গুচ্ছ গুচ্ছ তোলা পাতা পড়ে আছে, ছেঁচে কেউ তার রঙের রূপসজ্জা করেনি। পুষদের কথা আলাদা। কিন্তু "নমু মেয়েদের চোখ ভরে আসে জলে"। আর দুলালী? বীরপর্ব, ষড়যন্ত্র পর্ব, সম্ভাব্য যুদ্ধপর্ব এবং স্বভূমি থেকে নির্বাসন পর্ব পাঁচ থেকে আট পর্ব (পৃ ২৬-৫৫)—পেরিয়ে আমরা ফিরে আসি অ ামাদের মূল কাহিনিতে। শিমুলতলী ত্যাগের সময় সোজন দুলালীকে কিছুই বলে যেতে পারেনি। দুলালীর সম্বল এখন বিগত দিনের নানা সুখস্মৃতি, আর বর্তমানের শূন্যতা আর অনিশ্চয়তা। কে আছে যার কাছে দুলী তার মনের কথা খুলে বলতে পারে? তার আশৈশব বন্ধু সোজন যে তার জীবনের কতখানি সে কথা কে জানে? এদিকে গদাই মোড়ল তার অ াদরিনি মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফে লেছে। নতুন উৎসবের স্রোতে পড়শিদের দেশত্যাগের সকণ স্মৃতি সহজেই ভেসে যায়। নমুদের পাড়ায় বিয়ের গানে আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে। সবাই বিয়ের বিবিধ উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত। এদিকে অন্যেরা না শুনুক দুলী শুনেছে রাতের বেলা বাঁশির সেই মর্মভেদী উদাস সুর, দুলীর বুকের কান্দনখানি ধরা পড়েছে যে সুরে। সবাই যখন উৎসবে ব্যস্ত বিয়ের কনে হলুদে চান করে, লাল চেলি পরে, আলতায় পা রাঙিয়ে বিয়ে বা ড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সেই বনের কিনারায় যেখানে পলাতক সোজনের বাঁশি বাজে। তারপর এই গাথার দশম পর্ব জুড়ে দুই প্রেমিক প্রেমিকার যে সকণ আলাপ নিরলংকার ভাষায় তার সরল গভীর অনুভূতি আমাদের আলোড়িত করে। দুলী নিশ্চিত জানে সোজনকে ছাড়া তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, সে সাক্ষী মানে চন্দ্র সূর্য, বনের গাছপালা, ঝিজগৎকে যে সোজন ছাড়া ইহকালে পরকালে তার আর কেউ কোথাও নেই। সে সোজনকে বলে কোনও অজানা দূর দেশে তারা পা লিয়ে গিয়ে বাসা বাঁধবে, যত বাধাবিপত্তিই আসুক তারা পরস্পরকে কখনও ছাড়বে না। কিন্তু সোজন পুষ, শুধু প্রেমিক এবং শক্তিশালী নয়, বিবেকবানও বটে। সে জানে, তারা যদি পালিয়ে যায় তার দাম দিতে হবে সেই মুসলমানদের যারা শিমুলতলী গাঁ থেকে পালিয়ে এসে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। নমশূদ্ররা দল বেঁধে তাদের আত্রমণ করে তাদের নতুন বসতি পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। জেনেশুনে এত বড় সর্বনাশের দায় সে কেমন করে নেবে? তা ছাড়া তাদের এই মিলন কোনও সমাজই তো মেনে নেবে না। তারা একদিন না একদিন ধরা পড়বে, ভয়াবহ শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু দুলীর গভীর একান্ত আবেদনের স্রোতে সোজনের সব বিবেচনা বিবেকিতা ও আপত্তি ভেসে যায়। সোজন বলে

সাক্ষী থাকিও আল্লা-রসুল, সাক্ষী থাকিও
যত পীর-আউলিয়া,
এই হতভাগী বালিকারে আমি বিপদের পথে
চলিলাম নিয়া।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য! সাক্ষী থাকিও
আকাশের যত তারা,
আজিকার এই গহন রাতের অন্ধকারেতে
হইলাম ঘর ছাড়া।

।। চার ।।

দুলী আর সোজন এসে পলাতক প্রেমের কুড়ে বাঁধে গড়াই নদীর তীরে। (আমার নিজের জীবনের আনন্দঘন একটি বছর কেটেছে এই নদীর ধারে, অধ্যাপনা, পুঁথিলেখা, ছাত্রদের নিয়ে নদীতে প্রত্যহ সাঁতার কাটা, তাদরে সঙ্গে মিলে বিসর্জন

অভিনয়, সাহিত্য দর্শন সমাজতত্ত্ব নিয়ে কত আড্ড আলোচনা, কত কৌতুক, কত অ্যাডভেঞ্চার! হায় স্মৃতি! আঙুলের ফঁাক দিয়ে জলের মতো গলে যায়।) এই কাব্যকাহিনির ত্রয়োদশ পর্ব জুড়ে দুলী আর সোজনের সেই সরল অথচ অপরূপ, বর্ণিল ও বহমান, প্রাকৃতিক পটভূমির সঙ্গে রঙ্গিলা আত্মীয়তা গড়ে ওঠার বড় মধুর ছবি এঁকেছেন জসীমউদ্‌দীন। (অনেক বছর পরে ঢাকায় তখনকার তণ কবি আল মাহ্‌মুদের "সোনালী কাবিন" পড়ে জসীমউদ্‌দীনের কথা মনে পড়েছিল। হায়! সেই একদা প্রিয় কবি আল মাহ্‌মুদের সঙ্গে ভাবভাবনার ক্ষেত্রে এখন প্রায় অসেতুসম্ভব দূরত্ব!) জসীমের শব্দ দিয়ে আঁকা ছবির পর ছবি—চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে পড়ে আমার বড় ভালবাসার চিত্রকর মার্ক শাগালের লিরিকধর্মী ছবির কথা।

লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ, মটরের রঙ আর
জিরা ও ধানের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার!
যেন একখানি সুখের কাহিনী নানান আখরে ভরি
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি।

কুটিরের বেড়ার গায়ে দুলী এঁকেছে যেমন বেহুলা-লখাই, জন্মদুখিনী সীতার ছবি তেমনই তারই পাশাপাশি কারবালার কণ কাহিনি। আর এঁকেছে ডালিম গাছের নীচে লায়লা মজনুর কবর, আর ছেড়ে আসা সেই শিমুলতলী গাঁয়ের মসজিদ। কিন্তু প্রেমের এই লিরিকের পিছনে উঠছে ট্র্যাজিকের ঝড়। বিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে কনে, সারা গ্রাম বেরিয়ে পড়েছে তার খোঁজে। খোঁজ না পেয়ে অবশেষে আবার সেই নায়েবেরই কাছে প্রণিপাত। নায়েব তো এমনই একটি সুযে াগের অপেক্ষায় ছিল। এবারে সে নমশূদ্রদের ক্ষেপিয়ে তুলল। এর শোধ তোলবার উপায় মুসলমানদের একেবারে কচুক াটা উচ্ছেদ। চাগিয়ে উঠল খুনে বৃত্তি। এদিকে মলুদ-শরিফ উপলক্ষে মোল্লা বাড়ির উঠানে সাত গেরামের ছেলেমেয়ে স াজগোজ করে উৎসব করতে একত্র হয়েছে। সেখানে শুভ্র কেশ শুভ্র শ্মশ্রু মনির মিঞা কোরাণ পাঠ করছেন, তাঁর দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে লুবানের ধোঁয়ার মতো সুগন্ধ। সবাই একমনে নবীর কাহিনি শুনছে। এমন সময় উৎসবের সুর কেটে গেল। খবর এল নমুরা দল বেঁধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলমান নিধন করতে আসছে। এবারে লড়াই অনিবার্য, মুন্সি সাহেব যখন অনেক বলেও তাদের শান্ত করতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত হার মেনে বললেন তোমরা যদি সবাই লড়াই করেই মরতে চ াও তবে আমাকেও সঙ্গে নাও। তারপর পঞ্চদশ সর্গে সেই ভয়ঙ্কর দাঙ্গার বিবরণ।

গ্রাম জ্বলিল, ঘর পুড়িল, দেশ হল ছারখার
কিবা নমু মুসলমানের হুঁস নাহিক কার।
সকল মানুষ হদ্দ বেহুঁশ পতঙ্গেরই মত,—
আপন হাতে জ্বালল আগুন, আপনি হতে হত।

সারাদেশে হাহাকার উঠল, 'শ্মশান ঘাটায় রাত্রিদিবায় চিতার পরে চিতা," আর গ্রাম জুড়ে কবরের পর কবর। ফায়দা ওঠালেন নায়েব মশায়। শিমুলতলীতে তাঁর আগের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গ্রাম উচ্ছেদ করে জমিদারের হাট বসল। সোনার শিমুলতলীতে

নমু-মুসলমানের কেহ আর নাহি সে গাঁয়।
আজকে তারা চিতায় চিতায়, গহন মাটির গোরে,
ঘুমিয়ে আছে, হাজার ডাকেও শব্দ নাহি করে।

দুলালী-সোজন কিন্তু এই দাঙ্গার মধ্যে পড়েনি। বেশ সুখেই অজ্ঞাতবাসে ছিল তারা। কিন্তু সোজন তো পুষ, সে ঠিক করল অন্য গাঁয়ের এক পাটের ব্যাপারীর সঙ্গে ভাগে কাজ করবে, তাতে নাকি "কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা"। ব্যাপারীর সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য দূরে সফরে যাবে। ফেরবার সময় দুলীর জন্য আনবে "জলে-ভাসা-শাড়ী", "ময়ূরের পাখা", "গলার হাঁসুলী", "দুটি পায়ের গোল খাড়ু"। দুলীর মিনতি নিষেধ সে মানল না, বেরিয়ে পড়ল ব্যাপারীর নাওয়ে। দিনের পর দিন যায়, দুলী তাদের জীবনের কাহিনি ঘরের দেয়ালে একটির পর একটি আঁকে, আর শেষে আঁকে গড়াই নদীতে দূরদেশি মাঝির নৌকো, আর

ঘাটের কেনারে প্রতীক্ষমানা দাঁড়ায়ে একটি মেয়ে
দুটি চোখ তার ভরিয়াছে জলে কাঁখের কলসী চেয়ে।

হায়রে প্রতীক্ষা! সোজন ফেরে বটে, তবে পুলিশের সঙ্গে, হাতে হাতকড়া পরে। নায়েব তার নামে নারী হরণের মামলা ঠুকে দিয়েছে। বিচারে তার সাত বছরের জেল হয়। কিন্তু মহা ঘোড়েল নায়েবও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায় না। দাঙ্গা করতে গিয়ে গদাই মোড়ল তার সাত সাতটি পোলা হারিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে তার শোধ তুলল। একদিন বিলের ধারে খুঁড়ে পাওয়া গেল কবরের গর্তে নায়েব মশায়ের আধখানা শরীর।

।। পাঁচ।।

কিন্তু না, কাহিনি এখানে শেষ হয়নি। আমি যে কিছুটা বিস্তারিতভাবে এই কাহিনির কথা লিখছি, তার একটা কারণ আমার এ লেখা যাঁরা পড়বেন তাঁদের ভিতরে অনেকেই হয়ত সোজন বাদিয়ার ঘাট পড়েননি। তবে প্রধান কারণ অনেকদিন পরে পড়তে বসে এই কাহিনি আমাকে পেয়ে বসেছে। সোজন-দুলী ভিনাস-আডোনিস নয়, রোমিও-জুলিয়েট নয়, এমনকী মিরান্ডা-ফার্ডিনান্ডও নয়। বাংলাদেশের গ্রাম্যপ্রেমের কথা স্ট্র্যাটফোর্ড অন এভনের কবি জানবেন কোথা থেকে। আমাদের জোড়াসাঁকোর মহাকবিও জানতেন না। পদ্মার বোটে বসে কিছু দেখা যায়, অনেক ভাবা যায়, আশ্চর্য সব গল্প এবং কবিতা লেখাও সম্ভব, কিন্তু গ্রাম্য দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ের প্রেমের নিরলঙ্কার ট্র্যাজেডি মহা প্রতিভাবান শহুরে কবিদের সম্ভবত অনুভব এবং প্রকাশের বাইরে। মোদ্দা রবীন্দ্রযুগে বাস করেও নজল যেমন তাঁর নিজস্ব জগৎ, ভাষা এবং ছন্দ নির্মাণ করেছিলেন, জসীমউদ্‌দীনও তেমনই একেবারে ভিন্ন এক জগতের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা গড়তে চেয়েছিলেন। আত্মীয়তা যে শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি সে দোষ তাঁর নয়, সে দোষ উচচবর্গের অভিজাতচি শহুরে বাঙালি মুখ্যত হিন্দু পাঠক-পাঠিকাদের।

বাংলাদেশের গ্রাম ইথাকা নয়, সেখানে দুলীর পক্ষে পেনেলোপি হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সাত বছর দীর্ঘ সময়। দুলীর কথা কে শুনবে? তার "মনের অনল যে নেভে না" কবি ছাড়া সে কথা কে জানে? যে বিধি দুলীর কপালে এমন দুর্ভাগ্যের কথা লিখেছিল তার কি নিজের কখনও এই যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা হয়েছে? দুলীর আবার বিয়ে হয়—তার সিঁথেয় সিঁদুর, দু-হাতে কাঁকন, গোলাভরা ধান, "চন্দ্রের সম সোয়ামীর খ্যাতি"। এদিকে সাত বছর কেটে গেছে, সোজন ছাড়া পেয়ে যোগ দিয়েছে বেদের দলে। একদিন সেই দল ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছল দুলীদের গ্রামে। মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল বেদে-বেদেনিদের কাছে হরেক রকম সৌখিন জিনিস কেনবার জন্য। দুলীও এল, আর এক বুঝি আচিন বেদে তাকে বলল ঃ

তোমার লাগিয়া এনেছি কন্যা,
রাম লক্ষণ দুগাছি হাতের শাঁখা,
চীন দেশ থেকে এনেছি সিঁদুর
তোমার রঙিন মুখের মমতা মাখা।

কী দাম শুধাতে বেদে বলল ঃ

আমার শাঁখার কোনো দাম নাই
ওই দু'টি হাতে পরাইয়া দিব বলে, বাদিয়ার ঝুলি মাথায় লইয়া
দেশে দেশে ফিরি কাঁদিয়া নয়ন জলে।
সিঁদুর আমার ধন্য হইবে,
ঐ ভালে যদি পরাইয়া দিতে পারি,
বিগানা দেশের বাদিয়ার লাগি
এইটুকু দয়া কর তুমি ভিন-নারী।

এরপর কি আর বিগানা দেশের বাদিয়া আর ভিন দেশের নারীর মধ্যে কোনও আড়াল বজায় থাকতে পারে। কিন্তু দুলী যে তার নতুন সংসারে জড়িয়ে গেছে। স্বামী থাকতে প্রণয়ীকে গ্রহণ করবার মতো মেয়ে তো সে নয়।

কে তুমি? কে তুমি? সোজন! সোজন!
যাও-যাও-তুমি! এক্ষুনি চলে যাও!
আর কোনো দিন ভ্রমেও কখনো

উড়ানখালীতে বাড়াওনা তব পাও।
ভুলে গেছি আমি, সব ভুলে গেছি
সোজন বলিয়া কে ছিল কোথায় কবে,
ভ্রমেও কখনো মনের কিনারে
আনিনাক তারে আজিকার এই ভবে।

কিন্তু ভুলেছি বললেই কি ভোলা যায়? তবু দুলী বারবার সোজনের মনে আঘাত দিয়ে বলল, পুরোনো সব স্মৃতি মুছে ফেলতে। সাত বছর ধরে সোজন যে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচেছিল তা দুলীর প্রত্যাখানের আঘাতে ভেঙে গেল। বুকে চিতার জ্বালা নিয়ে টলতে টলতে সোজন ফিরে চলল। কিন্তু দেবতারাই নাকি নারী চরিত্র বোঝেন না, সোজন তো নিতান্ত চাষির ঘরের ছেলে, এখন বেগানা দেশের বেদে। সে তার বুকের ব্যাথা উজাড় করে বাঁশি বাজাতেই জানে। সেইদিন রাতে দুলী খুব স াজল, পরনে জামদানি শাড়ি, পায়ে হাতে আলতার দাগ, সিঁথিতে পু করে সিঁদুর, নানা ফুলে সেজে যে স্বামীর সঙ্গে সে ছ'মাস কথা পর্যন্ত বলেনি, তাকে অনেক ভালবাসার কথা বলল। কিন্তু নিষ্ঠুর বাঁশি যে বেজেই চলেছে। দুলী সব ঘরদোর জানলা বন্ধ করল, কানে তুলো দিল, কিন্তু বাঁশি যে তাকে ডেকেই চলেছে। বাঁশির সুর শুনতে শুনতে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়ল। তখন অসহায় দুলী কী করে!

সাক্ষী থাকিও চন্দ্র সূর্য আর যত দেবগণ
তোমরা সকলে শুনিতেছ এই অভাগীর ক্রন্দন।
সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর, আমারে ডাকিছে বাঁশী,
কাঞ্চা বয়সে পরাইয়া মোর গলায় কঠিন ফাঁসী।....
সাক্ষী থাকিও রাতের আঁধার—তারার বসন ধরে,
সাক্ষী থাকিও বসুমতী মাতা, নাগের মাথার পরে;
এই হতভাগী চলিল আজিকে লয়ে তার ভাঙা বুক,
নিয়ে যাও সবে—নিয়ে যাও তার জীবনের সব সুখ।

স্বামীর পায়ে কপালখানি ঘসে শেষ বিদায় নিয়ে দুলী দুয়ার খুলে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ল। বাঁশি তখন চিরবিদায়ের সুরে বাজছে, দুলী তোমাকে অনেক ব্যথা দিয়েছি, এই ভেবে ক্ষমা করো আমি তার হাজার গুণ ব্যথা পেয়েছি। অবশেষে দুলী এসে পৌঁছল সেই বাঁশিওয়ালার কাছে। কিন্তু তার আগেই গভীর হতাশায় সোজন বিষ-লক্ষের বড়ি খেয়েছে। এখন শুধু দুলীর রূপটুকু শেষবার দেখতে দেখতে সে চিরকালের মতো চোখ বুজতে চায়। আর যখন তার না আছে ফেরার পথ না মিলিত জীবনের সম্ভাবনা, তখন বড় বেদনায়, বড় অসহায় আত্মোৎঘাটনে দুলী ডুকরে উঠল

তোমরা পুষ কি করে বুঝিবে একেরে পরাণ দিয়া,
নারীর জীবন কি করে বা কাটে আরেরে বক্ষে নিয়া।
নিজের সঙ্গে অনেক যুঝিয়া পারিলাম নাক আর,
বুঝিলাম আর সাধ্য নাহিক এ জীবন বহিবার।....
আজো দুলী তার সোজনেরে ছাড়া কাহারেও নাহি জানে,
সোজন তাহার ঘরে ও বাহিরে দেহে মনে আর প্রাণে।

কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। নতুন করে শুর আর সময় নেই। পরদিন গাঁয়ের লোকেরা এসে দেখল বালির চরে "একটি যুবক একটি যুবতী আছে গলাগলি করি"। আর তারপর থেকে নদীর সেই ঘাটটির নাম সোজন বাদিয়ার ঘাট।

।। ছয় ।।

জসীমউদ্‌দীনের এই কাব্যকাহিনি নিয়ে এই বিশদ রচনার প্রথম কারণ অবশ্যই এটির যথার্থ কাব্যগুণ। ভারতচন্দ্র নয়, ম াইকেল নয়, রবীন্দ্রনাথ নয়, নজল নয়, তাঁর সমকালীন বিদগ্ধ অধ্যাপক কবিবৃন্দ নয়, জসীমের মডেল ছিল পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য গীতিকা। এবং এই বিশেষ প্রকৃতির কাব্য রচনায় তিনি তাঁর সমকালে এবং পরবর্তীকালে অপ্রতিম। আমার ধারণা এই ধার াটিকে অটুট রেখে সমৃদ্ধতর করার ক্ষমতা ছিল এক সময়ে আল মাহ্‌মুদের। কিন্তু সে পথে তিনি বেশি দূর এগোননি।

ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত যে মনটি নিয়ে জসীমউদ্‌দীন নজলের পরই দেখা দিয়েছিলেন আল মাহ্‌মুদ সে পথ থেকে সরে গেলেন। বাংলাদেশের সমকালীন অন্য কবিরা তাঁদের দেশ স্বাধীন হবার পরও কলকাতার কড়া শহুরে নেশা ছাড়তে পারেননি।

কিন্তু আমার দ্বিতীয় কারণটি কবিতা-প্রীতি থেকে উৎসারিত নয়। আমরা অনেকে আজ বুঝতে পারছি প্রকৃতি থেকে সরে এসে, প্রকৃতিকে শুধুমাত্র আমাদের প্রয়োজন মেটানোর উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, আমরা ক্রমেই নীরস, জীর্ণ, নিঃসঙ্গ, আত্মবিভক্ত, নির্বান্ধব হয়ে পড়ছি। টেকনোলজি এবং নগরায়ণের প্রবল শক্তিকে হয়ত রুদ্ধ করা যাবে না, কিন্তু , এখনও পৃথিবীর এবং অবশ্যই আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বিশ্ব থেকে বিযুক্ত গ্রাম অচলায়তন হয়ে ওঠে, কিন্তু বিশ্বের দ্বারা গ্রাসিত গ্রাম আর গ্রাম থাকে না। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শেষ জীবনে মানবেন্দ্রনাথ, অন্য দেশে শুমেকার, ইলিচ, লেভি স্ট্রাউসের মতো ভাবুকরা গাছপালা ঘেরা পারস্পরিক আত্মীয়তাবন্ধনে যুক্ত ছোট ছোট গ্রামের পুনর্জ্জীবনের কথা ভেবেছিলেন। একুশ শতকে "বিশ্বায়নে"র নামে যে "মার্কিনায়নে"-র প্রবল প্রচেষ্টা চলেছে—যা সফল হলে সব স্ত্রীপুরুষই হয়ে দাঁড়াবে মণ্ডাকৃতি নিঃসঙ্গ মানুষ — তার প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক চেষ্টা কবে শুরু হবে? গ্রামকে আমরা আর কতদিন ভুলে থাকব? শহর থেকে শহরতলি, সেখান থেকে মফস্বলের সাহিত্য রচিত হচ্ছে। গ্রামের উজ্জীবনে কি কবিদের কিছু ভূমিকা নেই? তাঁর জন্মের শতবর্ষে জসীমউদ্‌দীনকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করার এটাই দ্বিতীয়, হয়ত বা মুখ্য কারণ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com